সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
সংলাপ সংক্ষেপ
সেপ্টেম্বর ২০২৪

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়
নাগরিক ভাবনা

ছাত্র-জনতার আত্মত্যাগের দর্শন সামনে রেখে কাজ করতে হবে

আলোচিত বিষয়

- আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা
- টেলিফোনে আড়িপাতা ও মানবাধিকার
- পুলিশে সংস্কার
- ব্যাংক খাতে সংস্কার
- কর্মসংস্থান
- বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা
- খাদ্য নিরাপত্তা
- শ্বেতপত্র প্রণয়ন
- শিক্ষা খাতের সংস্কার
- স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার
- আন্দোলনের ডকুমেন্টেশন তৈরি
- অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ
- সংবিধানের সংস্কার আনয়ন
- দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কার
- মত প্রকাশের স্বাধীনতা
- বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- নাগরিক সংগঠনের কাজ সহজীকরণ

cpd.org.bd
cpd.org.bd
cpdbangladesh
CPDBangladesh

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
বাড়ি ৪০/সি, সড়ক নং ১১ (নতুন)
ধানমন্ডি, ঢাকা - ১২০৯, বাংলাদেশ
ফোন: (+৮৮ ০২) ৫৫০০১১৮৫, ৫৫০০১৯৯০
ই-মেইল: info@cpd.org.bd
ওয়েবসাইট: www.cpd.org.bd

প্রেক্ষাপট

ছাত্র-জনতার গণ-আন্দোলনের মুখে ২০২৪ সালের ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঘটে। এরপর ৮ আগস্ট একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। প্রচলিত সরকার ব্যবস্থায় অনাস্থা ও বিপুল জনপ্রত্যাশার সন্ধিক্ষণে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। বর্তমান বাস্তবতায় অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের করণীয় সম্পর্কে আলোচনার লক্ষ্যে ২০২৪ সালের ১৪ আগস্ট রাজধানীর লেকশোর হোটেলে *'অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের চ্যালেঞ্জ ও করণীয়: নাগরিক ভাবনা'* শীর্ষক সংলাপের আয়োজন করে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)। সংলাপে এ মুহূর্তে দ্রুততার সঙ্গে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কোন কোন কাজ সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে, সে বিষয়ে কথা বলেন আলোচকরা।

বিদ্যমান পরিস্থিতিতে সরকারের সামনে চ্যালেঞ্জের মাত্রা, বিস্তৃতি ও তীব্রতা অপরিমেয়। সেগুলো বিভিন্ন পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা হচ্ছে। এদিনের আলোচনার বিষয়বস্তু তিনটি স্তম্ভে বিভক্ত করা হয়—আইন-শৃঙ্খলা ঠিক করা ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা আনয়ন, অর্থনীতি পুনরুদ্ধার এবং শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতের পুনর্গঠন। এ বিষয়বস্তুর ওপর আলোচকরা তাদের আলোচনায় নানা সুপারিশ তুলে ধরেন।

আইন-শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা

এ বিষয়ের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে দেশে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন স্থানে লুটতরাজ ও ভাঙচুরের মতো ঘটনা ঘটছে। এর বাইরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রতি মানুষের আস্থাহীনতা, সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা ও নির্যাতন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আত্মবিশ্বাস দুর্বল হওয়া, অবকাঠামোগত ক্ষয়ক্ষতি, ভবিষ্যৎ সহিংসতার আশঙ্কা, প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে শূন্যতা, এই শূন্যতা পূরণে উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব, কর্মকর্তাদের অনুপস্থিতি, প্রশাসনিক কার্যক্রমে গতি আনয়নের চ্যালেঞ্জ, দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার ও কাঠামোগত পরিবর্তনের সূচনার চ্যালেঞ্জ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আইন-শৃঙ্খলা ঠিক করা ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা আনয়ন

এ বিষয় নিয়ে আলোচকরা বলেন, বর্তমান সরকারের আশু করণীয় হচ্ছে আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ঠিক করা। এক্ষেত্রে বেশকিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। একটি চ্যালেঞ্জ হচ্ছে, প্রশাসনের মধ্যে বিগত সরকারের অনেকেই আছেন যারা সে সময় নানা অনিয়মের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এছাড়াও অনেকে মন্তব্য করেন যে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাষ্ট্রীয় বাহিনী থেকে দলীয় বাহিনীতে

> আইন-শৃঙ্খলা ব্যবস্থা ঠিক করা, রাজস্ব আহরণ, এডিপি বাস্তবায়ন, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় সংস্কার এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে গতি আনয়ন ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি হ্রাস করা।

পরিণত হয়েছে। তাদের নিপীড়নের হাতিয়ারে পরিণত করা হয়েছিল, যার ফলে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের সঙ্গে সঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। অনেকে পালিয়ে গেছেন, অনেকে গ্রেফতার হয়েছেন। শোনা যায়, অনেকে সেনানিবাসে হেফাজতে আছেন। হেফাজতে যারা আছেন, তাদের নাম জানার অধিকার নাগরিকদের রয়েছে। তাদের যদি গ্রেফতার করা হয়ে থাকে, তাহলে আদালতে হাজির করতে হবে।

বক্তারা বলেন যে, বিগত সরকারের সময় তিন ধরনের অন্যায় হয়েছে। এর মধ্যে একটি হচ্ছে মানবতাবিরোধী অপরাধ। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে কমপক্ষে ৭০০ মানুষ নিহত হয়েছেন এবং হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছেন। এই মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার হওয়া দরকার। দ্বিতীয়ত, কতগুলো ফৌজদারি অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। নানাভাবে মানুষের অধিকার হরণ করা হয়েছে এবং নির্যাতন-নিপীড়ন করা হয়েছে।তৃতীয়ত, অর্থ লোপাটের মতো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে। ব্যাংক লুট হয়েছে। অর্থপাচার ও দুর্নীতি করা হয়েছে। এসব অপরাধেরও বিচার হতে হবে। সে বিচারের জন্য আশু করণীয় বিষয় হচ্ছে, এসব বিষয়ের সঠিক তদন্ত করতে হবে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তদন্তে যারা দোষী সাব্যস্ত হবেন তারা যেন সঠিক বিচার পান, সে বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় যেসব বাহিনী দলীয় বাহিনীতে পরিণত হয়েছে, সেগুলোকে ফের রাষ্ট্রীয় বাহিনীতে পরিণত করতে হবে। এটি অনেক কঠিন কাজ। এক্ষেত্রে যারা নিপীড়কের দোসর ছিলেন, তাদের বাদ দিয়ে এত দিন যারা বঞ্চিত ছিলেন তাদের দিয়ে বাহিনী পুনর্গঠন করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে হবে, তারা যেন আবার দলীয় বাহিনীতে পরিণত না হন।

এছাড়াও বক্তারা বলেন, প্রশাসনেও দলীয়করণ করা হয়েছে। প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলীয় পরিচয়কে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। তাই পিএসসিরও সংস্কার হওয়া দরকার। এছাড়া আপিল বিভাগে একজন ব্যতীত অন্য সব বিচারক পদত্যাগ করেছেন। এরপর একজনকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। একজন বিচারপতিকে সরাসরি হাইকোর্ট বিভাগ থেকে আপিল বিভাগের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। এই উদাহরণ সৃষ্টি হওয়ায় ভবিষ্যতে অনেকে এক লাফে প্রধান বিচারপতি হওয়ার জন্য ধরনা দেবেন। ভবিষ্যতে এ ধরনের নিয়োগের ক্ষেত্রে সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, দেশে নানা ধরনের মাফিয়াতন্ত্র ছিল। সেগুলো যাতে নতুন করে ফিরে না আসে, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। উদাহরণ দিয়ে তারা বলেন, আগে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা গার্মেন্টের ঝুট ব্যবসা করতেন। এখন নতুন কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি এক্ষেত্রে যুক্ত হওয়ার জন্য এরই মধ্যে পোশাক কারখানার মালিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে শুরু করেছেন। এখন আগের সিস্টেমই যদি নতুন করে ফিরে আসে, তাহলে এই পরিবর্তন কোনো কাজে আসবে না।

গোয়েন্দা সংস্থার সংস্কার

বক্তারা বলেন, দেশের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো দুর্নীতিগ্রস্ত এবং দলীয় আনুগত্যের দোষে দুষ্ট। বক্তারা 'আয়নাঘর' বিলুপ্ত করার প্রস্তাব দিয়ে বলেন, আমরা কেবল একটা আয়নাঘরের কথা জানি; কিন্তু দেশে আরও কতগুলো আয়নাঘর আছে, তা আমাদের জানা নেই। এ ধরনের যতগুলো বেআইনি নিপীড়ন কেন্দ্র আছে, সেগুলো চিহ্নিত করে গুঁড়িয়ে দিতে হবে। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় সংঘটিত গুম-খুনের বিচার হওয়া উচিত। সরকার যাতে গোয়েন্দা তথ্যের ওপর ভিত্তি করে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত না নেয়, সে বিষয়ে বক্তারা অনুরোধ করেন।

পুলিশে সংস্কার

বিগত আন্দোলনে পুলিশ গণশত্রুতে পরিণত হয়েছিল। তাদের সরকারের নানা বেআইনি আদেশ মানতে বাধ্য করা হয়েছিল। এমন পরিস্থিতিতে পুরো পুলিশ বাহিনী একটি সংস্কারের দিকে তাকিয়ে আছে। এর মধ্যে রয়েছে, পুলিশ ব্যবস্থার আইন কাঠামোগত সংস্কার। দ্বিতীয়ত, বিডিআর বিদ্রোহের পর বাহিনীটিকে যেমন নতুনভাবে সাজানো হয়েছে, বর্তমান পুলিশকেও নতুনভাবে সাজানো প্রয়োজন। এক্ষেত্রে তাদের ইউনিফর্ম পরিবর্তনসহ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ বাস্তবায়ন করতে হবে।

টেলিফোনে আড়িপাতা ও মানবাধিকার

তথ্য-প্রযুক্তির বিষয়ে বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে যখন ইন্টারনেট ও তথ্য-প্রযুক্তির বিস্তার শুরু হয়েছিল, তখন আমরা ধারণা করেছিলাম, এটি মানুষের বাকস্বাধীনতা আরও বৃদ্ধি করবে। কিন্তু বিগত কয়েক বছরে আমরা দেখেছি, মানুষের মৌলিক মানবাধিকার খর্ব করার কাজে প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রযুক্তির মাধ্যমে এতটাই স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল যে, মানুষ সাধারণ মোবাইল ফোনে কথা বলতে ভয় পেতেন। এর পরিবর্তে হোয়াটসঅ্যাপের মতো বিকল্প উপায়ে যোগাযোগ করে থাকেন সবাই। সবসময়ই এমন একটি ধারণা আমাদের তাড়া করে বেড়ায় যে কোনো ব্যক্তি হয়তো আমার কল রেকর্ড সংগ্রহ করছেন।

তারা উল্লেখ করেন, কোনো রাজনৈতিক সরকার এ বিষয়টি সংস্কার করবে না। তাই স্বল্প মেয়াদে সরকারকে এই আড়িপাতার বিষয়টি সংস্কার করতে হবে। এই সরকারে চারজন মানবাধিকার-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। সুতরাং তারাই এটি বন্ধ করতে সক্ষম হবেন বলে বিশ্বাস। এক্ষেত্রে এনটিএমসির মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে বিলুপ্ত করতে হবে। কী ধরনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে এনটিএমসি নাগরিকদের অধিকার খর্ব করেছে, সে বিষয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করতে হবে। আলোচকরা জানান, মানবাধিকার কমিশন যেন নাগরিকদের জন্য কাজ করে এবং এ সংস্থার জবাবদিহি কী হবে, সে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে।

বক্তারা আরও বলেন, কয়েকটি মোবাইল আর্থিক সেবা (এমএফএস) ব্যবহার করে সরকারি বিভিন্ন ভাতা নাগরিকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে এই মাধ্যমে কয়েক হাজার কোটি টাকা বিতরণ করা হয়। কিন্তু এই অর্থের একটি বড় অংশ সঠিক উপকারভোগীর কাছে পৌঁছে না, সেটি প্রযুক্তির সহায়তায় লুট হয়ে যায়।

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের চ্যালেঞ্জ

অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রেক্ষাপট বর্ণনায় যেসব সমস্যার কথা উল্লেখ করা হয় তার মধ্যে রয়েছে, রাজস্ব আহরণে অপর্যাপ্ততা, এডিপি বাস্তবায়নে শ্লথ গতি, সরকারি ব্যয় সংকুলানে ব্যর্থতা, ব্যাংক থেকে সরকারের উচ্চ মাত্রায় ঋণ, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, ক্রমবর্ধমান খেলাপি ঋণ, ব্যাংক খাতে তারল্য সংকট, রপ্তানি আয়ে ধীর গতি, রেমিট্যান্স প্রবাহে মন্থরতা, ব্যক্তি খাতে বিনিয়োগে স্থবিরতা, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে অবক্ষয়, আমদানিতে ক্রমহ্রাসমান প্রবণতা, টাকার ব্যাপক অবমূল্যায়ন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে ধীরগতি, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির সহজপ্রাপ্যতার সংকট এবং তথ্য-উপাত্যের ব্যত্যয় ও ঘাটতি। বক্তারা বন্ড মার্কেটের সংস্কার সাধনের প্রস্তাব দেন। কেননা অনেক অস্তিত্বহীন কোম্পানি অনিয়মের মাধ্যমে বন্ড ছেড়ে মোটা অঙ্কের অর্থ বের করে নিয়ে গেছে।

এ বিষয়ে আলোচকরা বলেন, যেসব ব্যক্তি ব্যাংক থেকে অর্থ লোপাট করেছেন, তারা যেন দেশ থেকে পালাতে না পারেন, সে বিষয়ে এখনই পদক্ষেপ নিতে হবে। তাদের দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে। আর সকল ব্যাংকের পরিচালকদের ব্যাংক হিসাব জব্দ করতে হবে। যতক্ষণ তারা লুটপাটের পূর্ণাঙ্গ হিসাব দেবেন, ততক্ষণ তারা যাতে দেশ ত্যাগ করতে না পারেন, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। বক্তারা বলেন, এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনের পলিসি কী হবে, সেটি নির্ধারণ করছেন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের চেয়ারম্যান। তিনি যদি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা না করে এটি করে থাকেন, তাহলে সেটি দেশের অর্থনীতির জন্য সর্বনাশের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

ব্যাংক খাতে সংস্কার

ব্যাংক খাতে সংস্কারের বিষয়ে আলোচকরা বলেন, বিগত ১৪—১৫ বছরে বাংলাদেশ একটি পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছিল, যেখানে কোনো কথা বলা যেত না। অথচ কথা বলার সুযোগ থাকলে ব্যাংক খাতের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যেত। তারা বলেন, ব্যাংক খাতকে এ সরকারের জন্য দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের খাত হিসেবে বিবেচিত হওয়া উচিত। এ খাত নিয়ে মানুষের যে ধারণা, তার চেয়েও অনেক বেশি খারাপ অবস্থায় রয়েছে ব্যাংক ব্যবস্থা। খবরের কাগজে কেবল গুটিকয়েক নাম আমরা জানতে পারি। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক খাত ক্ষতিগ্রস্ত করার পেছনে কত নাম আছে, তার কোনো হিসাব নেই। এ খাতে সংস্কারের জন্য সর্বাগ্রে কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সংস্কারের আওতায় আনতে হবে।

এ খাতে সংস্কারের জন্য নাগরিক সমাজ ও অন্যান্য অংশীজনের জন্য সহযোগিতার সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ব্যাংক খাতের নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের যথেচ্ছ রেগুলেশন প্রদান

> সরকারি চাকরিতে নানা ধরনের প্রণোদনা ও বিশেষ সুবিধা বন্ধ করে বেসরকারি চাকরির প্রতি মানুষের আগ্রহ তৈরি করা।

বন্ধ করতে হবে। কোনো রেগুলেশন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আগে জ্যেষ্ঠ ব্যাংকারদের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের মতামত নিতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক বছরে হাজারের ওপরে আদেশ জারি করে। পৃথিবীর কোথাও এভাবে আদেশ জারি করা হয় না।

বক্তারা বলেন, ব্যাংক খাতের যেসব তথ্য-উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়, তার প্রায় সবই ভিত্তিহীন। খেলাপি ঋণের অঙ্ক, ঋণ সঞ্চিতি, মূলধন—সবই মিথ্যা অঙ্ক দিয়ে সাজানো হচ্ছে। এ খাতের প্রকৃত চিত্র খুবই খারাপ। এ সমস্যা সমাধানে যদি সবাই একত্রে কাজ না করেন, তাহলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া কঠিন হবে। ব্যাংক খাতে অতিসত্বর আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসরণের সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনতে হবে। বিগত সময়ে দেশে অর্থনীতির কোনো মৌলিক বিষয় অনুসরণ করা হয়নি। তারা নিজেদের ইচ্ছামতো নিয়মকানুন তৈরি করেছেন।

বাজার ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ আরোপ এবং দাম নির্ধারণ করা মুক্তবাজার অর্থনীতির ধারণার পরিপন্থি বলে উল্লেখ করে বক্তারা বলেন, এটা করা হলে বাজারে আরও অস্থিরতা তৈরি হবে। একই সঙ্গে ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রণোদনার সমালোচনা করেন তারা। প্রণোদনার সংস্কৃতি বন্ধ করার তাগিদ দেন তারা। তারা বলেন, ব্যাংকের দিকে দ্রুততার সঙ্গে নজর দিতে হবে, ক্রেডিট লাইন ঠিক করতে হবে। তা না হলে বিভিন্ন জরুরি পণ্য আমদানির এলসি বন্ধ হয়ে যাবে। সারসহ বিভিন্ন পণ্যের আমদানি গতিশীল রাখতে হলে বহির্বিশ্বের ব্যাংকগুলোর সঙ্গে দেশের ব্যাংকগুলোর সংযোগ স্বাভাবিক করতে হবে।

কর্মসংস্থান

বক্তারা উল্লেখ করেন, ২০১৫ সালে সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন দ্বিগুণ করে দেওয়া হয় এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও বাড়ানো হয়। কিন্তু বেসরকারি খাত সেটি করতে পারেনি, কারণ দেশের অর্থনীতি সেভাবে অগ্রসর হয়নি। ফলে সরকারি চাকরি আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। এতে করে বেসরকারি চাকরির প্রতি চাকরি প্রার্থীদের আগ্রহ কমতে থাকে এবং বেসরকারি খাত মেধাবী জনশক্তি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। কোটা সংস্কার আন্দোলনের অন্যতম কারণও এটি। এক্ষেত্রে বেসরকারি চাকরিতে যাতে তরুণরা যেতে আগ্রহী হয়, সে ধরনের উদ্যোগ নিতে হবে। কারণ প্রতিবছর যে ২০ লাখ নতুন মুখ শ্রমবাজারে যুক্ত হচ্ছে, তাদের সবার কর্মের সুযোগ তৈরির সক্ষমতা সরকারের নেই। বেসরকারি চাকরিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রয়োজনে সরকারি চাকরিতে সুযোগ-সুবিধা কমাতে হবে। এছাড়া স্বল্প মেয়াদে কর্মসংস্থান বাড়ানোর জন্য কুটির, মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগে (সিএমএসএমই) ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ওপর জোর দিতে হবে। যারা বিদেশে কর্মসংস্থানের জন্য যেতে চান, তাদের ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংককে উদ্যোগ নিতে হবে।

বক্তারা বলেন, ভারত ও চীন আইটি সেক্টরে অনেক বেশি সহায়তা প্রদান করে। সে তুলনায় বাংলাদেশে সহযোগিতা খুবই অপ্রতুল। এক্ষেত্রে কর্মসংস্থান ও বৈদেশিক মুদ্রায় আয় বাড়াতে ফ্রিল্যান্সিং হাব তৈরি করতে হবে এবং নানা ধরনের সহায়তা দিতে হবে। বক্তারা বলেন, কর্মসংস্থান বাড়াতে হলে দেশের বাণিজ্যনীতিকে যুগোপযোগী করে তুলতে হবে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, সরকারি চাকরিতে কেউ একবার প্রবেশ করলে তাকে অবসর পর্যন্ত যাওয়া লাগে। ২৫ বছর পর একজন স্বেচ্ছায় অবসরে যেতে পারেন। এই ব্যবস্থাটা পরিবর্তন করতে হবে। তার আগে যদি কেউ চাকরি থেকে যেতে চান তাহলে তাকে অবসর সুবিধা দিয়ে বিদায় দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এরপর যদি তিনি আবার চাকরিতে ঢুকতে চান, তাহলে ভিন্ন ভিন্ন স্তরে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে তার প্রবেশের সুযোগ দেওয়া উচিত। এটি বিশ্বের অধিকাংশ উন্নত দেশে আছে। সরকারি চাকরিতে নানা ধরনের প্রণোদনার সুবিধা দেওয়া রয়েছে। এর ফলে এটির প্রতি সবার আগ্রহ বেশি। আর সে কারণেই সাম্প্রতিক আন্দোলনটি হয়েছে। এসব বিশেষ সুবিধা বন্ধ হওয়া উচিত। তাহলে বেসরকারি চাকরির প্রতিও মানুষের আগ্রহ বাড়বে। সরকারি চাকরিতে কী ধরনের সুবিধা দেওয়া যাবে, সে বিষয়ে রুলস অব বিজনেসে উল্লেখ থাকতে হবে। এখনো আমরা বহুলাংশে পাকিস্তানি আমলের রুলস অব বিজনেস অনুসরণ করি। এটি পরিবর্তন করতে হবে। বাংলাদেশের জন্য একটি স্বতন্ত্র রুলস অব বিজনেস প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

আলোচকরা আরও বলেন, বাংলাদেশের একটি বড় খাত হচ্ছে অপ্রাতিষ্ঠানিক খাত। এ খাতে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান রয়েছে। পশ্চিমা দেশগুলোয় শোভন কর্মসংস্থান বলতে অনানুষ্ঠানিক খাত থেকে আনুষ্ঠানিক খাতে স্থানান্তরকে বোঝায়। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোয় সেটা হয় না। আমাদের দেশে অনানুষ্ঠানিক খাতটা আরও বহুদিন থাকবে এবং আরও বেশি সম্প্রসারিত হবে। এই অনানুষ্ঠানিক খাতকে কী উপায়ে আরও বেশি শোভন করে তোলা যায়, সে বিষয় নিয়ে ভাবতে হবে। অনানুষ্ঠানিক খাতে চাঁদাবাজি আছে। এসব ঠিক করার জন্য সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

পণ্যবাজারে গোষ্ঠীতন্ত্র বিলোপ করতে হবে

বক্তারা বলেন, দেশের ভোগ্যপণ্যের বাজার তিন-চারটি বড় প্রতিষ্ঠান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এগুলোর মধ্যে একটি শিল্পগ্রুপ দেশের ব্যাংক খাতের বৃহদাংশের নিয়ন্ত্রক ছিল এবং তারাই বাজারটা

> খাদ্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে কৃষিতে ভর্তুকি বাড়ানো, শিক্ষাক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনে শিক্ষা-সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা এবং স্বাস্থ্য খাতকে দলীয় প্রভাবমুক্ত করা।

নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু সরকার পরিবর্তনের পর তারা দৃশ্যপটে নেই। ফলে আমদানিনির্ভর প্রধান ভোগ্যপণ্য সয়াবিন তেল ও চিনির ক্ষেত্রে দু-এক মাসের মধ্যে একটা সংকট তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি নিরাপত্তা

বক্তারা বলেন, আগামী দু-এক মাসের মধ্যে দেশে একটি বড় চ্যালেঞ্জের জায়গা হয়ে উঠবে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত। ভারতের আদানি থেকে দেশে বিদ্যুৎ আসে। কিন্তু সম্প্রতি ভারত তাদের নীতি পরিবর্তন করেছে। এতে আদানির যে কেন্দ্র থেকে শতভাগ বিদ্যুৎ বাংলাদেশে আসার কথা, সেটির বিদ্যুৎ দেশটির অভ্যন্তরেও সরবরাহ করা যাবে। এমন পরিস্থিতিতে তারা যদি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়, তাহলে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দেবে। কারণ আমাদের বিদ্যুৎ সরবরাহ ভারতের ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই এ বিষয়ে এখনই আমাদের সচেতন হতে হবে। কাজেই সরকারকে জরুরি ভিত্তিতে জ্বালানি নিরাপত্তার কথা ভাবতে হবে। পৃথিবীতে এ ধরনের উদাহরণ আছে। রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের সময় গ্যাস রপ্তানি বন্ধ করে রাশিয়া পুরো ইউরোপকে ভুগিয়েছিল। কাজেই আমাদের এখনই সজাগ হতে হবে।

খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি নিয়ে অনেক বক্তা কথা বলেন। তারা বলেন, ভারত থেকে আমাদের অনেক পণ্য আমদানি হয়। তারা পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেওয়ায় আমাদের একবার বড় ধরনের সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। কাজেই এসব ক্ষেত্রে বিকল্প নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। বক্তারা বলেন, বাংলাদেশে ক্রমেই উর্বর জমির পরিমাণ কমে আসছে। তাই খাদ্যপণ্যের সরবরাহ বাড়াতে কৃষিতে ভর্তুকি বাড়াতে হবে।

শ্বেতপত্র প্রণয়ন

স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা (এলডিসি) থেকে ২০২৬ সালে বাংলাদেশের উত্তরণ ঘটবে। বিগত সরকার ত্রুটিপূর্ণ উপাত্তের ভিত্তিতে দেশের অর্থনীতির মূল্যায়ন করে এলডিসি থেকে উত্তরণের বিষয়ে উদ্যোগ নিয়েছিল। ওই সময়কার তথ্য-উপাত্তে অর্থনীতির যে চিত্র প্রদর্শন করা হয়েছে, বাস্তবে অর্থনীতি সেই জায়গায় আছে কি না, সে বিষয়ে একটি শ্বেতপত্র প্রকাশের প্রস্তাব দেন বক্তারা। শ্বেতপত্রে যদি পরিলক্ষিত হয়, অর্থনীতির অবস্থা এলডিসি থেকে উত্তরণের উপযোগী নয়, তাহলে এই গ্র্যাজুয়েশন প্রয়োজনে ১০ বছর পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কারণ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন খুব গুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় নয়।

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত পুনর্গঠন

শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাত পুনর্গঠনের আলোচনার সূচনালগ্নে এখানকার সমস্যাগুলো উল্লেখ করা হয়। এসব সমস্যার মধ্যে রয়েছে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্বাভাবিকীকরণ, শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, শিক্ষক প্রশিক্ষণের মানোন্নয়ন, শ্রমবাজারের সঙ্গে শিক্ষা থেকে অর্জিত দক্ষতার অসামঞ্জস্যতা দূরীকরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে দলীয় রাজনৈতিক প্রভাব দূরীকরণ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠা, শিক্ষার সঙ্গে তথ্যপ্রযুক্তির যথাযথ সংশ্লেষ, সর্বজনীন স্বাস্থ্যসেবার ব্যবস্থাকরণ, স্বাস্থ্য খাতে নিজ পকেট থেকে উচ্চ ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবার মান নিয়ে আস্থার ঘাটতি, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীর অপ্রতুলতা, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রগুলোর মানোন্নয়ন ও জনসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি। এর বাইরে শিক্ষা খাতের পুনর্গঠনের সঙ্গে কর্মসংস্থান, বিশেষ করে যুব কর্মসংস্থানের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আর এই ছাত্র আন্দোলনের মূল বিষয়টিই ছিল কর্মসংস্থান। চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে যুবসমাজ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, তার মধ্যে রয়েছে চাকরির অপ্রতুল সুযোগ, শিক্ষার নিম্নমান ও দক্ষতার অমিল, উদ্যোক্তা হওয়ার সীমিত সুযোগ, নারী চাকরিপ্রার্থীদের সামাজিক প্রতিবন্ধকতা, কম্পিউটার ও ইন্টারনেট সুবিধার অভাব, ঘুষ ও দুর্নীতির কারণে কর্মসংস্থানের সীমিত সম্ভাবনা, চাকরিতে অভিজ্ঞতার অযৌক্তিক প্রয়োজনীয়তা, সরকারি চাকরির জন্য অপেক্ষা এবং আর্থিক সীমাবদ্ধতা।

শিক্ষা খাতের সংস্কার কাজ

বক্তারা উল্লেখ করেন, শিক্ষা খাতের সংস্কার করার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনার পাশাপাশি অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করা আবশ্যক। অভিভাবকরা নতুন পাঠ্যক্রম নিয়ে খুবই চিন্তিত। একই সঙ্গে শিক্ষাঙ্গনের নিরাপত্তা নিয়েও তারা উদ্বিগ্ন।

বক্তারা বলেন, পাঠ্যপুস্তকে ব্যাপকহারে দলীয় চিন্তা-ভাবনা ঢোকানো হয়েছে। ভুল-ত্রুটি সংশোধনের পাশাপাশি এসব বয়ান সংস্কার করতে হবে। এর পাশাপাশি শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। এ খাতে রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে কম। শেখ রাসেল ডিজিটাল ল্যাবের মতো উদ্যোগের মাধ্যমে বিপুল দুর্নীতি হয়েছে। এসব দুর্নীতির মুখোশ উন্মোচন করতে হবে। পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ার একটি মেয়ে রোবোটিক্স নিয়ে পড়তে চায়। তাদের এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। শিক্ষা সংস্কারের আলোচনায় পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, আদিবাসী ও প্রতিবন্ধীদের বিষয়টি বিবেচনায় নিতে হবে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, বিশ্বের কোনো দেশে দুটি শিক্ষা মন্ত্রণালয় নেই। কিন্তু বাংলাদেশে এ ব্যবস্থা চালু রয়েছে। একটি হচ্ছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, অন্যটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এর ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে আমলাতান্ত্রিক জটিলতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে দুটি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কোনো প্রয়োজন নেই। শিক্ষা-সংক্রান্ত সার্বিক কার্যক্রম একটি মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনা প্রয়োজন। একই সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাকে মূলধারার শিক্ষার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে হবে, যাতে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীরা কর্মে নিযুক্ত হওয়ার দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

আলোচকরা জানান, পুরো দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে শিক্ষকদের সুবিধাদি বাংলাদেশে সবচেয়ে কম। এক্ষেত্রে শিক্ষকদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বেতন স্কেল নির্ধারণ করতে হবে, যাতে মেধাবীরা শিক্ষাক্ষেত্রে আসতে আগ্রহী হন। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়কে শিক্ষা মন্ত্রণালয় বা ইউজিসির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে।

স্বাস্থ্য খাতে সংস্কার

বক্তারা বলেন, দেশে ক্যানসারসহ বিভিন্ন অসংক্রামক রোগের চিকিৎসা এখনো আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে পৌঁছেনি। তাছাড়া এ খাত অত্যন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত। সেই দুর্নীতির স্বরূপ বিগত করোনা মহামারিকালে ফুটে উঠেছে। স্বাস্থ্যখাতকে একদিকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে, অন্যদিকে এখানে দলীয় লেজুরবৃত্তি রোধে উদ্যোগ নিতে হবে। কিছু ব্যক্তি দলীয় প্রভাবের মাধ্যমে বাড়তি সুবিধা আদায় করে নেবে, আর যাদের দলীয় সংশ্লেষ নেই তারা সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে—এমন পরিস্থিতি থাকলে স্বাস্থ্য খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করা যাবে না। তাই স্বাস্থ্য খাতকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হলে আগে দলীয় প্রভাবমুক্ত করতে হবে। সরকারি হাসপাতাল থেকে রেফার করে কোনো রোগীকে যেন বেসরকারি হাসপাতালে যেতে বাধ্য করা না হয় এবং বেসরকারি হাসপাতালে মানুষ যে সেবা নিতে যাবেন, সেখানে যেন সেই সেবার পর্যাপ্ততা থাকে, সে বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, মানুষের ব্যক্তিগত চিকিৎসা ব্যয় হ্রাস করার লক্ষ্যে সর্বজনীন স্বাস্থ্য বিমার মতো বিষয়গুলোকে চালুর উদ্যোগ নিতে হবে। তারা জানান, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে সেবাগ্রহীতার ব্যক্তিগত ব্যয় অনেক বেশি। এই ব্যয়ের একটি বড় অংশ খরচ হয় ওষুধ ক্রয় ও রোগ নির্ণয়ের জন্য। ওষুধের দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে শিল্পমালিকদের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে, যে কারণে ওষুধের দাম অনেক বেশি। কাজেই ওষুধের দাম নির্ধারণে একটি স্বাধীন কাঠামো তৈরি করতে হবে। এছাড়া চিকিৎসকরা যেসব স্বাস্থ্য পরীক্ষার পরামর্শ দিয়ে থাকেন, তার অনেকগুলো জরুরি নয়। কিন্তু এজন্য রোগীর অর্থ খরচ হয়। এর পেছনে ওষুধ কোম্পানি ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারগুলোর পক্ষ থেকে চিকিৎসকদের প্রদান করা নানা প্রণোদনার বড় ভূমিকা রয়েছে। এটি অবশ্যই বন্ধ করতে হবে এবং ওষুধশিল্পকে একটি নৈতিক কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়নে চিকিৎসকদের জবাবদিহির আওতায় আনতে বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল (বিএমডিসি)কে শক্তিশালী করতে হবে। স্বাধীনতার পর থেকে এ পর্যন্ত মাত্র তিনজন ডাক্তারকে যথাযথ প্রক্রিয়ায় জবাবদিহির আওতায় আনা হয়েছে। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কাজ করতে হবে।

বক্তারা জানান, এ আন্দোলন একটি নতুন স্বাস্থ্য সমস্যাও সৃষ্টি করেছে। তা হচ্ছে আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ আহত হয়েছে। এই আহতদের কীভাবে পুনর্বাসন করা হবে, সেটি একটি বড় প্রশ্ন। আহতদের অনেকের শারীরিক চিকিৎসার পাশাপাশি মনঃসামাজিক সহায়তা প্রয়োজন হবে। আবার অনেকের আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন হবে। আমরা কীভাবে তাদের সহায়তা করতে পারি, সে বিষয়ে ভাবতে হবে। স্বাস্থ্য খাত ঠিক করার জন্য একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা দরকার। এই কমিশনের কাজ হবে স্বাস্থ্য খাতের সমস্যা সমাধান করা।

অন্যান্য বিষয়

আন্দোলনের পুরো ডকুমেন্টেশন তৈরি করতে হবে

বক্তারা বলেন, যে আন্দোলনটা সংঘটিত হলো, সেটির যথাযথ ডকুমেন্টেশন তৈরির উদ্যোগ নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এ আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃত হয়ে না যায়। প্রতিটি সরকারের আমলে ইতিহাস বিকৃতির অনেক নজির পরিলক্ষিত হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে ইতিহাস বিকৃত হয়ে না যায়, সে উদ্যোগ নিতে হবে।

আন্দোলনে হতাহতের সঠিক সংখ্যা নিরূপণ করতে হবে

বক্তারা বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে রূপ নেওয়ার ঘটনাপ্রবাহে যেসব মানুষ নিহত ও আহত হয়েছেন,

> ছাত্র আন্দোলনের যথাযথ ডকুমেন্টেশন তৈরি করা যেন ভবিষ্যতে এ আন্দোলনের ইতিহাস বিকৃত হয়ে না যায়।

তাদের সঠিক পরিসংখ্যান নিরূপণ হওয়া আবশ্যক। যারা আহত হয়েছেন তাদের উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে হবে। এক্ষেত্রে কেবল শারীরিক চিকিৎসা নয়, মানসিক চিকিৎসাও নিশ্চিত করতে হবে। এর পাশাপাশি এসব হতাহতের ঘটনায় যারা দায়ী, তাদেরও একটা তালিকা হওয়া দরকার। সঠিক অপরাধী চিহ্নিত করে তাদের বিচারের আওতায় আনতে হবে।

আন্দোলনের দর্শন নিয়ে ভাবতে হবে

আলোচকরা উল্লেখ করেন, যে আন্দোলনের মাধ্যমে সরকারের পতন হলো সেটি শুরু হয়েছিল মূলত কোটা সংস্কারের দাবিতে। পরবর্তী সময়ে এটি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র-জনতার আন্দোলনে রূপ নেয়। আন্দোলনের এই রূপান্তরের প্রক্রিয়ার দর্শন আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। এ আন্দোলন কেবল অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটার মধ্যে নৈতিকতা আছে এবং রাজনীতিও আছে। আন্দোলনে যে ধরনের অন্যায়-অবিচার হয়েছে, তার বিচার করতে হবে এবং যেসব সংস্কারের দাবি তোলা হচ্ছে, সেগুলোকে কীভাবে স্থায়ী রূপ দেওয়া যায়, সে বিষয়ে ভাবতে হবে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, ১৯৯০ সালেও একটি রাজনৈতিক সমঝোতা হয়েছিল। সেই সমঝোতার একটি বড় অংশ ছিল সরকার গঠন ও নির্বাচন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে এই ইনস্টিটিউশনটা ধ্বংস হয়ে গেছে। কাজেই এবার যেসব সংস্কার হবে, সেগুলোকে অবশ্যই স্থায়ী রূপ দিতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ কত দিন হবে

প্রথমেই যে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে হবে তা হচ্ছে, অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ কত দিন হবে? তার ওপরই নির্ভর করবে এ সরকার কতটা সংস্কার কার্যক্রম হাতে নিতে পারবে এবং সম্পন্ন করতে পারবে। তারা উদাহরণ দিয়ে বলেন, ওয়ান-ইলেভেনের সরকার আগে থেকেই জানিয়েছিল, তারা দুই বছর থাকবে। কিন্তু তারা যখন কাজের তালিকা তৈরি করল, দেখা গেল যে ছয়-সাত বছরেও সে কাজ শেষ করা সম্ভব নয়। সেজন্য মেয়াদটা ঠিক করা আবশ্যক। সরকারের নিজের মধ্যেই সে বিষয়ে স্পষ্টতা থাকতে হবে। সে অনুযায়ী মৌলিক বিষয়গুলো সংস্কারে হাত দিতে হবে। সেগুলোর প্রায়োগিক বিষয়ে এ সরকার বেশি দূর এগোতে পারবে না। সেটা করতে গেলে অযথা সময়ক্ষেপণ হবে।

সরকার কী কী কাজ করতে চায় তার তালিকা করতে হবে

এ উপদেষ্টা পরিষদকে সফল হতে হবে। এর কোনো বিকল্প নেই। তাদের ব্যর্থতা মানে আমাদের সবার ব্যর্থতা। এজন্য আমাদের সকলকে যার যার অবস্থান থেকে কাজ করতে হবে। এক্ষেত্রে উপদেষ্টা পরিষদ কী কী কাজ করবে, তার একটি অগ্রাধিকার তালিকা থাকলে ভালো হয়। একটি নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা করতে পারলে আরও ভালো হয়। সেটা জানা থাকলে আমরা সরকারকে কোন কোন ক্ষেত্রে সহায়তা করতে পারি, সেটি বোঝা সহজ হয়। তারা যদি তিন মাস বা ছয় মাসের জন্য থাকতে চায়, তাহলে এক ধরনের করণীয় হবে। আর তারা যদি রাষ্ট্র মেরামত করতে চায়, তাহলে আরেক ধরনের করণীয় হবে। সঠিক বিচারের জন্য পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় সংস্কার আনতে হবে। আইনকানুনের পরিবর্তন করতে হবে।

দেশের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার

বক্তারা উল্লেখ করেন, এক মাসের আন্দোলন-সংগ্রামের কারণে বহির্বিশ্বে দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে। ফলে এমন অস্থির পরিবেশে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসতে আগ্রহী হবেন না। এক্ষেত্রে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ করা এবং বহির্বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়াতে আমাদের ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিতে হবে। সেজন্য শক্তিশালী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে দেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জাতিগত সংখ্যালঘুসহ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ নিরাপদ বোধ করেন এবং রাজনৈতিক কর্মসূচিকেন্দ্রিক অস্থিরতা হ্রাস পায়।

বক্তারা বলেন, আন্দোলন চলাকালে সেটি দমানোর জন্য ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর ফলে দেশের আইটি খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পাশাপাশি সারাবিশ্বে এটির সমালোচনা হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের কোনো ঘটনার উদ্ভব না ঘটে, সে বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

> অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ নির্ধারণ করে কাজের তালিকা প্রস্তুত করা যেন তা বাস্তবায়নে অযথা কালক্ষেপণ না হয়।

আন্দোলনের সময় বিদেশে অবস্থান করা এক আলোচক বলেন, ইন্টারনেট বন্ধ থাকার ফলে তিনি দেশের কোনো খবর পাননি। কারও সঙ্গে যোগাযোগও করতে পারেননি। এতে তার মধ্যে এক অজানা আতঙ্ক ভর করেছিল। শুধু তাই নয়, দেশের সিএমএসএমই খাতের প্রায় পাঁচ লাখ নারী উদ্যোক্তা ইন্টারনেট সংযোগ না থাকার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তারা পণ্য বিক্রির প্ল্যাটফর্ম অ্যামাজনসহ প্রয়োজনীয় কোনো ওয়েবসাইটে প্রবেশ করতে পারেননি। তাদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা হিসাবের মধ্যে আনা হয়নি। এর জন্য যারা দায়ী, তাদের বিচার হতেই হবে। কারণ ইন্টারনেট সংযোগ সবার অধিকার।

একটি রাজনৈতিক সমঝোতা স্থাপন

সরকারকে অনেক ধরনের সংস্কার কাজে হাত দিতে হবে। কী কী সংস্কার কাজ করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে একটি জাতীয় সনদ প্রণয়ন করতে হবে। তবে সব সংস্কার এ সরকারের পক্ষে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। এজন্য একটি রাজনৈতিক সমঝোতা সৃষ্টি করতে হবে, যাতে পরবর্তী নির্বাচিত সরকার সংস্কার কার্যক্রমগুলো চালিয়ে নিয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর সমন্বয়ে একটি চুক্তি হতে হবে এবং শর্ত থাকতে হবে, আগামীতে নির্বাচনের মাধ্যমে যারাই ক্ষমতায় যাবে, তারা এই চুক্তি বাস্তবায়ন করবে।

বক্তারা বলেন, এ সরকার কত দিন সময় পাবে, সেটি একটি বড় প্রশ্ন। কাজেই তারা সব ধরনের সংস্কার কাজ শেষ করে যেতে পারবে না। সেক্ষেত্রে তাদের উচিত হবে একটি সুপারিশমালা তৈরি করে দেওয়া, যা পরবর্তী রাজনৈতিক সরকার বাস্তবায়ন করবে। আর পরবর্তী সময়ে যারাই ক্ষমতায় আসুক তারা যাতে সুপারিশগুলো বাস্তবায়নে দায়বদ্ধ হয়, সেজন্য রাজনৈতিক সংলাপের মাধ্যমে একটি সমঝোতা সৃষ্টি করতে হবে। কারণ শুধু আইন পরিবর্তন করেই সবকিছু শোধরানো যাবে না। আইন সঠিকভাবে বাস্তবায়নে রাজনৈতিক সদিচ্ছার কোনো বিকল্প নেই।

সংবিধানের সংস্কার আনয়ন

বক্তারা বলেন, দেশের সংবিধানে একটি আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। বক্তারা বিভিন্ন ধরনের সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য টাস্কফোর্স গঠনের সুপারিশ করেন। অতীতে এ ধরনের টাস্কফোর্স গঠন করে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশ প্রণয়নের নজির রয়েছে বলে বক্তারা জানান।

বক্তারা বলেন, দেশের বর্তমান সংবিধানে স্বৈরাচার সৃষ্টির অনেকগুলো উপাদান বিদ্যমান। এমনকি ১৯৭২ সালের সংবিধানেও এমন উপাদান ছিল। পরবর্তী সময়ে নানা সংশোধনীর কারণে সংবিধান আরও বেশি ত্রুটিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। তারা বলেন, সংস্কার কার্যক্রম যদি রাজনৈতিক দলগুলোর সমঝোতার ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে ফের আমাদের অন্ধকূপে পতিত হওয়ার আশঙ্কা আছে। রাজনৈতিক দলগুলো ১৯৯০ সালে একত্রিত হয়ে অনেকগুলো অঙ্গীকার করেছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে তারা সেগুলো বাস্তবায়ন করেনি। তাছাড়া ১৯৯০ সালের অভ্যুত্থান হয়েছিল রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে। কিন্তু এবারের অভ্যুত্থান হয়েছে ছাত্র-জনতার নেতৃত্বে। কাজেই তাদেরই ঠিক করতে হবে আগামী দিনে রাষ্ট্র কীভাবে চলবে তার রূপরেখা। সেটা করার ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে আমাদের সংবিধানেই বড় সংস্কার আনতে হবে। এক্ষেত্রে এই সংবিধানে একনায়ক সৃষ্টি হওয়ার যত উপাদান আছে সব পরিবর্তন করতে হবে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের আমলাতন্ত্র ও জনবল নিয়োগ, পদায়ন ও কাঠামো পৃথক হতে হবে। এছাড়া মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশন, পুলিশ কমিশন, স্থানীয় সরকার প্রভৃতি সংস্থাকে সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে আনতে হবে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্তন আনতে হলে আগে সাংবিধানিক কাঠামোটা ঠিক করতে হবে। সেজন্য একটি রাজনৈতিক সংলাপের আয়োজন করতে হবে। আর সেই সংলাপ আয়োজনের একটি সুযোগও তৈরি হয়েছে।

স্থায়ী সংস্কার কমিশন

আলোচকরা বলেন, বর্তমান সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে সংস্কারের বিষয়ে বিশদ আলোচনা হচ্ছে। এই ধারাবাহিক সংস্কার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের উচিত একটি স্থায়ী সংস্কার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা। সেই কমিশনের অধীনে শিক্ষা বা স্বাস্থ্য খাতের মতো বিভিন্ন খাতের সংস্কারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সেকশন

> বিচার ব্যবস্থাকে আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে উচ্চ আদালত ও নিম্ন আদালতের কার্যক্রমকে স্বাধীনভাবে কাজ করার ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতে হবে।

থাকবে এবং এই সংস্কার সবসময় চলমান থাকবে। দ্বিতীয়ত, একটি সাংবিধানিক আদালত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটি এজন্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে, যাতে সংবিধানের নানা বিষয়ে সেই আদালত রেজুলেশন আনতে পারে। এটি বিভিন্ন দেশে আছে।

বক্তারা জানান, মানবাধিকার কমিশন, দুর্নীতি দমন কমিশনসহ অন্যান্য যেসব কমিশন গঠন করা হয়েছিল, তখন এর গঠনকাঠামোয় বিভিন্ন খাতের বিশেষজ্ঞ এবং সরকারি ও বেসরকারি নানা অংশীজনের প্রতিনিধিদের পদায়নের সংস্কৃতি ছিল। কিন্তু এখন আর এ বিষয়টি নেই। এসব কমিশন পুরোপুরি অবসরপ্রাপ্ত আমলাদের করায়ত্ত হয়ে গেছে। তারা কাজ করেন সরকারের নির্দেশনামতো। ফলে মানুষ সেখান থেকে সেবা পায় না।

দুর্নীতি দমন কমিশনের সংস্কার দরকার

বক্তারা বলেন, দুর্নীতি দমনের ক্ষেত্রে যে বিষয়টি অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত তা হচ্ছে, দুর্নীতি দমন কমিশন যেন বর্তমান ও ভবিষ্যতের দুর্নীতিগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে পারে। সেজন্য এ সংস্থার প্রয়োজনীয় পুনর্গঠন প্রয়োজন। দুর্নীতি দমন কমিশনের কমিশনাররা কী উপায়ে নিয়োগপ্রাপ্ত হবেন এবং তাদের জবাবদিহি কীভাবে নিশ্চিত হবে, সে বিষয়টি আগে নির্ধারণ করতে হবে।

বক্তারা উল্লেখ করেন, ওয়ান-ইলেভেনের সরকারের সময় একটি রেগুলেটরি কমিশন ও একটি ট্রুথ কমিশন গঠন করা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো পরবর্তী সময়ে ঠিকমতো কাজ করতে পারেনি। কারণ এসব কমিশনের মূল চেতনা অনুধাবনে এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ব্যর্থ হয়েছেন। আর কখনো যেন এমন না হয়, সে বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে।

আমলাতন্ত্রে সংস্কার

আলোচকরা বলেন, আমাদের আমলাতন্ত্রে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন। পুরো আমলাতন্ত্রের মনোভাব হচ্ছে তারা প্রভু, আর দেশের ১৮ কোটি মানুষ তাদের দাস। তারা নিজেদের সর্বজ্ঞানী ভাবেন এবং তাদের মনোভাব এমন যে, তারা ছাড়া আর কেউ কিছু জানেন না। তারাই শুধু বলবেন, আর দেশের মানুষ শুধু শুনবে; কেউ কোনো কথা বলতে পারবেন না, কেউ বিকল্প কোনো মতামত দিতে পারবেন না, বিকল্প কোনো ধারণা দিতে পারবেন না—আমলাতন্ত্রের এই মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। দেশের মানুষ তাদের দাস নয়। তারা প্রজাতন্ত্রের কর্মচারী এবং দেশের নাগরিকদের সেবা প্রদানের জন্য তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। দেশের মানুষ কর প্রদান করে, সেই করের অর্থেই তাদের বেতন হয়। এ বিষয়টি তাদের সবসময় মনে রাখতে হবে।

বক্তারা বলেন, আগে একসময় সরকারি চিঠির শেষের দিকে লেখা থাকত 'ইয়োর ওবিডিয়েন্ট সার্ভেন্ট'। সরকারি চাকরিজীবীরা জনগণের সার্ভেন্ট। এই জিনিসটা যখন তুলে দেওয়া হয়েছে, তখন থেকে সরকারি কর্মচারীদের চিন্তা পরিবর্তন হয়ে যাওয়ায় তারা নিজেদের জনগণের প্রভু ভাবতে শুরু করেছেন। সরকারি কর্মচারীরা যে জনগণের সার্ভেন্ট, সেই মানসিকতা আবার প্রতিস্থাপন করতে হবে।

আলোচকরা আরও বলেন, সরকারের সিভিল প্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন ও সামরিক প্রশাসনের সর্বস্তরে নানা ধরনের অপচয়ের খাত তৈরি করা হয়েছে। দেশে শিক্ষকদের সুযোগ-সুবিধা বাড়ানোর সময় টাকা থাকে না; অথচ ডিসি, এসপি, ওসি, ইউএনও সবাইকে কোটি টাকা মূল্যের পাজেরো গাড়ি দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক সচিবের সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য একজন পুলিশ সদস্য থাকেন। এক বাজেট আলোচনায় প্রশ্ন করা হয়েছিল, এর কোনো দরকার আছে কি না? অর্থমন্ত্রী কোনো জবাব দেননি। এসব বিষয়ে সংস্কার আনতে হবে।

তারা বলেন, প্রায় সব মন্ত্রণালয় ও বিভাগের সচিবরা বহাল তবিয়তে রয়েছেন। তারা বিগত সরকারের সুবিধাভোগী। এসব কর্মকর্তাকে পদে রেখে এই অন্তর্বর্তী সরকারের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে

জনগণের মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আর সেজন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থি সব ধরনের আইন বিলুপ্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে ত্বরিত ভিত্তিতে সাইবার নিরাপত্তা আইন

সংস্কার করতে হবে। বক্তারা উদাহরণ দিয়ে বলেন, ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের মাধ্যমে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষার্থীর পুরো শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত করে দেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে আর কেউ এমন বিভীষিকার শিকার না হন, সেজন্য এ ধরনের আইন সংস্কার করতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা দিতে হবে

বক্তারা উল্লেখ করেন, আমলাতন্ত্রের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করে বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। বর্তমানে উচ্চ আদালতের কার্যক্রম অনেকটা স্বাধীন হলেও নিম্ন আদালত সরকারের অনুগত হয়ে কাজ করে। ফলে বিচার প্রক্রিয়ার ওপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ থেকে যায়। এ থেকে রক্ষায় পুরো বিচার ব্যবস্থাকে স্বাধীনতা দিতে হবে।

সবুজ প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটানো

বক্তারা বলেন, দেশে সবুজ প্রযুক্তির বিপ্লব ঘটাতে হবে। এক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানির উৎপাদন বাড়াতে হবে। বাংলাদেশে দুই দশকেরও বেশি সময় আগে এ বিষয়ে উদ্যোগ নেওয়া হলেও তেমন সফলতা আসেনি। এক্ষেত্রে নানা সিন্ডিকেট কাজ করে, যারা সবুজ প্রযুক্তির বিস্তারকে আটকে দেয়। তারা বলেন, নবায়নযোগ্য শক্তির উন্নয়নের জন্য একটি বাড়ি একটি সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে।

আন্দোলনে শ্রমিকদের অবদান

আলোচনায় অংশ নিয়ে এক বক্তা বলেন, সাম্প্রতিক গণ-অভ্যুত্থানে প্রায় ২০০ শ্রমজীবী মানুষ মৃত্যুবরণ করেছেন। তাদের স্বীকৃতি দিতে হবে। বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে শ্রমিকরা স্বতঃস্ফূর্ত অংশ নিয়েছেন। কারণ বৈষম্যের বেদনা তাদের চেয়ে আর কেউ ভালো জানেন না। শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে যে বৈষম্য রয়েছে, তা নিরসনে একটি মানদণ্ড নির্ধারণ করতে হবে। তাদের জন্য মহার্ঘ ভাতা ও রেশন চালু করতে হবে। নারী শ্রমিকদের যে মজুরি বৈষম্য রয়েছে, তা ভালোভাবে মোকাবিলা করা দরকার। নারী শ্রমিকরা ৪০ বছর বয়সের পর শ্রমবাজার থেকে হারিয়ে যান। কী কারণে তারা হারিয়ে যান, তা অনুসন্ধান করতে হবে। যেসব সিঙ্গেল মাদার নারী শ্রমিক রয়েছেন, তাদের জন্য কারখানার কাছাকাছি ডরমিটরি স্থাপন করতে হবে। শ্রমিকদের সন্তানদের শিক্ষার বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে নিহত ও আহত শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট বিমা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

শ্রমিকদের জন্য সর্বজনীন পেনশনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রবাসী শ্রমিকদের যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। বিমানবন্দরে তাদের নানা হয়রানির শিকার হতে হয়। আর বিদেশ গমনেচ্ছুদের কাছ থেকে সিন্ডিকেটের মাধ্যমে লাখ লাখ টাকা বাড়তি অর্থ আদায় করা হয়। তাদের সঙ্গে নানাভাবে প্রতারণা করা হয়। এসব বন্ধ করতে হবে। তারা যাতে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে আগ্রহী হন, সে বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে। প্রবাসীদের পুরো রেমিট্যান্স ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে এলে বছরে ৩৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসবে। এই পরিমাণ রেমিট্যান্স এলে বৈদেশিক ঋণের জন্য আমাদের ধরনা দিতে হবে না। এছাড়া বৃদ্ধ শ্রমিকদের সমাজ কীভাবে দেখতে চায়, তার একটি রূপরেখা তৈরি করা দরকার।

বক্তারা উল্লেখ করেন, শ্রম মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রমদপ্তর এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তর কোনো কার্যকর ভূমিকা পালন করে না, যে কারণে বিদেশি অ্যাকর্ড ও অ্যালায়েন্সকে এখানে কাজ করতে হয়। সেজন্য এই দুই দপ্তরে সংস্কার আনয়ন করতে হবে, যাতে তারা যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে পারে। মন্ত্রণালয়ের আওতায় শ্রমিককল্যাণ তহবিলসহ একাধিক তহবিল আছে। এসব তহবিল থেকে শ্রমিকদের সহায়তা পাওয়ার কথা থাকলেও তারা পান না। এখান থেকে অর্থ লোপাট হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা দরকার। শ্রম আদালতগুলো শ্রমিকদের জন্য ন্যায়বিচার প্রতিপালনে কার্যকর ভূমিকা রাখছে না। এই আদালতের সংস্কার দরকার।

> শ্রমিকদের মজুরির ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করতে হবে। নারী শ্রমিকদের মজুরির পাশাপাশি মহার্ঘ ভাতা ও রেশন চালু করা প্রয়োজন। বৈষম্য দূর করে তাদের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা অতীব প্রয়োজন। বিশেষভাবে বক্তারা জানান, শিল্পাঞ্চলের জন্য যে শিল্প পুলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা শ্রমিক ও শিল্প মালিক কারও জন্যই কল্যাণকর হয়নি। কেবল মালিকের স্বার্থেই তারা ব্যবহৃত হয়েছে। শ্রমিক নিপীড়নের দায়ভার এড়াতে হলে শিল্প পুলিশ বিলুপ্তির দাবি অগ্রাধিকার পাবে।

> শ্রমিকদের জন্য সর্বজনীন পেনশন এবং প্রবাসী শ্রমিকদের যথাযথ মর্যাদা দিতে হবে। প্রবাসীদের পুরো রেমিট্যান্স বৈধ পথে ব্যাংকের মাধ্যমে দেশে আসলে বছরে ৩৫ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এত পরিমাণ রেমিট্যান্স এলে বৈদেশিক ঋণের জন্য আমাদের আর কোনো চিন্তাই করতে হবে না।

বক্তারা জানান, শিল্পাঞ্চলের জন্য যে শিল্প পুলিশ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, তা শ্রমিক ও শিল্প মালিক কারও জন্যই কল্যাণকর হয়নি। কেবল শ্রমিকদের নিপীড়নের জন্য তাদের ব্যবহার করা হয় বলে উল্লেখ করে এ শিল্প পুলিশ বিলুপ্তির দাবি জানানো হয়।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সৃষ্ট শূন্যতা পূরণ করতে হবে

বক্তারা জানান, সরকার পতনের পর সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বড় কর্তারা পদত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উপাচার্যসহ বিভিন্ন বড় পদের ব্যক্তিরা পদত্যাগ করেছেন। এর ফলে সবখানে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছে। এতে শাসন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। এই মুহূর্তে আশু করণীয় হচ্ছে, বিভিন্ন শূন্যপদ পূরণের মাধ্যমে শাসন ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

আদিবাসী ইস্যু

পাহাড়ে ও সমতলে বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীকে আদিবাসী হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানান বক্তারা। আদিবাসীদের বসবাসের এলাকায় সামাজিক বনায়নের নামে প্রকৃত বন উজাড় না করার পরামর্শ দেন তারা। পাশাপাশি আদিবাসীদের জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন প্রতিষ্ঠা এবং আদিবাসী সুরক্ষা আইন প্রণয়নের প্রস্তাব দেন বক্তারা।

এনজিও ও নাগরিক সংগঠনের কাজ সহজীকরণ

বক্তারা বলেন, সমাজের উন্নয়নের জন্য যেসব বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও) ও নাগরিক সংগঠন কাজ করে, তাদের নানা ধরনের ঝামেলা পোহাতে হয়। এসব সংগঠনের বিপরীতে বিদেশ থেকে যেসব অর্থ আসে, তা ছাড় করানোর জন্য এনজিও অ্যাফেয়ার্স ব্যুরোসহ তিন-চারটি প্রতিষ্ঠানে ধরনা দিতে হয়। এতে অনেক সময় তহবিল ফেরত চলে যায়। সমাজের উন্নয়নের স্বার্থে এই অর্থছাড়করণ প্রক্রিয়া সহজীকরণে উদ্যোগ নেওয়ার পাশাপাশি সব ধরনের আমলাতান্ত্রিক জটিলতা দূর করতে হবে। সরকারের সঙ্গে এনজিওর অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করতে হবে।

উপসংহার

কোটা সংস্কার আন্দোলনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে গিয়ে বক্তারা বলেন, বর্তমানে উচ্চ মূল্যস্ফীতি বিরাজ করছে, ব্যাংক খাতে বিশৃঙ্খলা চলছে এবং সরবরাহ কার্যক্রমে বিচ্যুতি ঘটেছে। সার্বিকভাবে আমরা একটা দুষ্টচক্রের মধ্যে পড়েছি। ৫৩ বছরের বাংলাদেশে প্রথম প্রজন্মের পর দ্বিতীয় প্রজন্মে এসে যখন জবাবদিহি ও স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠা করার কথা, তখন আর আমরা সামনের দিকে এগোতে পারিনি। ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় প্রজন্মের চ্যালেঞ্জ বেরিয়ে এসেছে। আমাদের আইন ও প্রতিষ্ঠানের অভাব নেই। এগুলোর প্রায়োগিক দিক আমাদের শক্তিশালী করতে হবে। আর সেটা করতে হলে এই শিক্ষার্থীদের কেবল শিক্ষাঙ্গনে ফিরে গেলেই হবে না, তাদের অতন্দ্র প্রহরীর মতো ভূমিকা পালন করতে হবে। গণতন্ত্রে যদি নজরদারি না থাকে, তাহলে অর্থনৈতিকভাবে উন্নত, সামাজিকভাবে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং পরিবেশগতভাবে টেকসই সমাজ গঠন করা সম্ভব হবে না। সে বিষয়ে এখন থেকেই যে সমাধান হয়ে যাবে তা নয়, তবে এখন থেকেই সে বিষয়ে চিন্তা করতে হবে।

সম্মানিত আলোচকবৃন্দ

সভাপতি

ড. ফাহমিদা খাতুন
নির্বাহী পরিচালক
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

নির্ধারিত আলোচক

ড. আহমদ মোশতাক রাজা চৌধুরী
আহ্বায়ক
বাংলাদেশ হেলথ ওয়াচ এবং
সাবেক ভাইস চেয়ারপারসন, ব্র্যাক

ড. বদিউল আলম মজুমদার
সম্পাদক
সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন)

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান
সম্মাননীয় ফেলো
সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)

জনাব এ. কে. এম. ফাহিম মাশরুর
প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বিডি জবস

মিজ নুসরাত তাবাসসুম
সমন্বয়ক
বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন

এই সংলাপ সংক্ষেপটি সিপিডি'র 'বাংলাদেশের উন্নয়নের স্বাধীন পর্যালোচনা' (আইআরবিডি) কার্যক্রমের আওতায় প্রস্তুত করা হয়েছে।

সিরিজ সম্পাদনায়: ড. ফাহমিদা খাতুন

এই সংলাপ সংক্ষেপটি প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছেন: মাসুম বিল্লাহ, যুগ্ম সম্পাদক, শেয়ার বিজ।

- *এই সংলাপ সংক্ষেপে প্রকাশিত মতামত আলোচকদের বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে। এর সাথে সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)-এর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে।*
- *সম্পূর্ণ আলোচনার ভিডিও সিপিডি'র ফেইসবুক এবং ইউটিউবে প্রকাশিত হয়েছে।*